কৌশিক চক্রবর্তীর প্রবন্ধমালা

কবিতার রূপ কবিতার অরূপ

বিচিত্র এই কবিতাযাপনে কখনও কখনও কোনো কবিতা কুসুমকোরক বিছানো পথের থেকে বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখেই সারাটা জীবন কাটিয়ে দেয়। প্রথাগত পাঠক- উল্লাস এমনিতে তাকে ছোঁয় না। শুধু আচমকা কোনো পাঠকের একলা দুপুরবেলা আলগোছে ছোটপত্রিকায় প্রকাশিত সেইসব কবিতায় হাত রাখলে... সেই বুঝি পাঠকের নবজন্ম, কবিতারও। প্রথাগত কবিতার আর পাঠকের ভিড়ে বীতশ্রদ্ধ হয়ে 'কুড়ি কুড়ি বছরের পার' স্বেচ্ছানির্বাসনে চলে গিয়েছিলেন জর্জ অপেন। অপেন ও তাঁর কবিতার আজ নবজন্ম হয়েছে। এভাবেও ফিরে আসা যায় ! এই অপেনই এক কবিতায় লিখেছেন – *The question is : how does one hold an apple/ who like apples/ And how does one handle/ Filth? The question is/ How does one hold something/ In the mind which he intends/ To grasp and how does the salesman/ Hold a bauble he intends/ To sell? The question is/ When will there not be a hundred/ Poets who mistake that gesture/ For a style*।

কোনটা যে gesture আর কাকে বলে style – কোন ছাঁচে কবিতাকে আটকাব, সেই ভেবে দৌড়চ্ছি। এদিকে আমরা তো *people hearing without listening* ... তাই, অজস্র শব্দমালার ভিড়ে যখন নীরব কোনো এক কবিতা অন্ধকারে আলো দেয় – তখন তাকে আর চিনতে পারি না। তার কারণ, সে কবিতা তো শুধু রূপের নয়, তার শেকড়ের মধ্যে অরূপও খেলা করে। বাংলাকবিতার দীর্ঘ রাস্তা পাড়ি দিয়ে এরকম কোনো কোনো কবিতার খোঁজ মেলে, যেখানে সেই অরূপের আলো। শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা যেমন –

এ জীবন – যেন সেই বায়োস্কোপ বাক্সের ভিতরে
কিছুকাল উঁকি দিয়ে দেখা,
রঙিন আনন্দ সুখ স্বপ্ন আর ব্যর্থ ভালোবাসা
অভিমান অশ্রুজল, শব্দময় চলমান ছবি !
আসলে রহস্য আছে বালক বয়সী দুই চোখে
তাই নীল বাক্স দেখে বারবার মুগ্ধ, ছুটে আসি।

যেমন, নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা –

'পড়ে যাবে যে !'
আমরা চিৎকার করে উঠি
কিন্তু জলের ফোঁটাটা
চোখের মধ্যে
ঠিক ঠিক জড়িয়ে থাকে
অন্তর্জলি পর্যন্ত।

আবার এর ঠিক পাশেই রাখি রঞ্জিত সিংহ- কে –

চোখ যেমন সবসময়ে ঠিক ঠিক দেখে না, এও তেমনি
সেই ভুল দেখা।

রাত্রে সিঙ্গল খাটে ঘুমুচ্ছি, এটা আমার আজীবনের সিঙ্গল খাট,
ওটা আমার পনেরো বছরের ইজিচেয়ার, যে রাত্রে
ঝাঁক ঝাঁক বাদুড় সফেদা গাছটাকে ঢেকে ফেলে সফেদা খায় –
আমার আর মণিকার সে দিন জন্মান্তর হয়, দুজনেই বাদুড় হয়ে যাই।

এই যে এক নির্মোহ নিয়ে কবি লেখেন, এই সন্ন্যাস আসলে অনুভূতির সন্ন্যাস। সমস্ত কিছু ত্যাগ করে যে শূণ্যতার নির্মাণ, সেখানেই সবচাইতে বেশি পূর্ণতা পুনর্নির্মিত হয়। কবি সেইভাবেই তাঁর কবিতায় জীবন, সত্ত্বা ও অনুভূতির এক সম্পূর্ণ ভোগরাগ উপলব্ধি করেন। এই অনুভূতির প্রগাঢ়তাই তাঁর কবিতার জিরেন রস। এই অনুভুতির নির্জনতাই তাঁর কবিতার তানকারি। এই অনুভূতির স্থৈর্যই তাঁর কবিতার গভীরতা। এই সন্ন্যাসে অনুভূতির ওপর আর কোনো মালিকানা থাকে না। এ কিন্তু দুঃখবিলাস নয়। এখানে হাসি ও দুঃখের মধ্যবর্তী সীমারেখা ভেঙে যায়। সেখানে ভালোবাসার ঘায়ে কান্নারা জেগে ওঠে, সেখানে নিবিড় বেদনাতেও পুলক লাগে গায়ে, চোখে ঘনায় ঘোর। বয়সের প্রজ্ঞায়, অনুভূতির প্রজ্ঞায় অভিজ্ঞতায় এ কবির নিজস্ব অর্জন।

সেই কবে শম্ভু রক্ষিত লিখেছিলেন –

তুমি ঈশ্বরকন্যা, তুমি আমাকে বিশুদ্ধ কবিতার জনক হতে সেদিন শেখালে
ব্যক্তিগত মৌলিক দৃশ্য থেকে ধূসর বিষয় নিয়ে আমি, ব্যক্ত অব্যক্তের
অবাস্তব মুহূর্তের স্বতন্ত্র আমি, আমার গভীরতর সাম্রাজ্যে
তুমি আছো, তুমি নেই
তোমার আশ্চর্য হবার মত বিশুদ্ধপ্রীতি, কৃত্রিম পদ্ধতিতে আকাশে
ওড়ার ব্যাপারে তুমি বয়সে প্রবীণ
তুমি ঈশ্বরকন্যা, অত মেহনত ও অর্থব্যয় পণ্ড করে কেন ভেসে যাবে
যখন ধাবমান দিনে বস্তুপিণ্ড ও ধোঁয়া- ঢাকা বরফ আবিষ্কার
তুষার ঝড়ে আমি নিজ- মর্ত্যসীমা চূর্ণ করে তোমারই জগতে প্রবেশ করেছি...

আর অতি সম্প্রতি রঞ্জিত সিংহ 'শিলাদিত্য: উৎসব সংখ্যা ১৪২৪'- এ এক কবিতায় লিখেছেন –

কুলমান আভিজাত্য চাই না। দিনরাত একা একা উড়ন্ত চিলের মতো কখনো নদীতে ছোঁ মেরে মাছ ধরব – ঘন জঙ্গলের ডহরে বাঁশিতে সাপ খেলাব, মৃত্যুবান্ধব পরিবেশে পিশাচবৎ, উন্মাদবৎ, জড়বৎ দিনাতিপাত করতে করতে নিজেকে যখন সম্পূর্ণ ভুলে যাব, সেইদিন তোমার জন্য আমার অপেক্ষা। বালুকণার মতো এই সুসঙ্গে লক্ষ বছর যদি কাটাতে হয় সূক্ষ্মে বা স্থূলে তাতেও আপত্তি নেই।

এই যে কবি বললেন নিজ- মর্ত্যসীমা চূর্ণ করার কথা, পিশাচবৎ, উন্মাদবৎ, জড়বৎ দিনাতিপাত করবার কথা – এইখানেই লেখা হয়ে গেল কবিতার সাধনমার্গের কথা। সেই সাধনায় কবির চোখ বন্ধ, কান অচল, সমস্ত জাগতিক সুতোর গ্রন্থি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন – এখন অনুভূতিই একমাত্র সত্য। আর সত্য সেই অনুভবের শব্দপ্রকাশ। এই বালুকণার জীবন, আপাত তুচ্ছসাধন – এটাই তো সত্যিকারের শিল্পীর, সত্যিকারের কবির 'অভিপ্রায়'। অর্থ নয়, যশ নয়, আরও এক বিপন্ন বিস্ময় খেলা করে কবির মনের মধ্যে। তাই সতিকারের কবিই 'প্রভাতে দাও অর্থ চিন্তা, মধ্যাহ্নে দাও যশ চিন্তা, দিনান্তে দাও অলস চিন্তা' বলে কাঁদতে পারেন। তাঁকে মানায় সেই কান্না। সভাসমিতির আলো, পুরস্কার- মঞ্চের আলো না। তাঁর মুখে প্রহর শেষের চৈত্র মাসের আলোটুকুই সবচাইতে ভালো সাজে। তাই সত্যিকারের একটা ভালো কবিতা পাঠকের দিনরাতের সর্বনাশ করে ছাড়ে। সেই কবিতায় তীব্র বেদনাতেও থাকে এক অন্তরীণ সুন্দর। প্রগাঢ় বেদনার মধ্যেও যিনি বিপ্রতীপ প্রেক্ষিতে সৌন্দর্যের জন্ম দেন, তিনিই সত্যিকারের শিল্পী। স্টিভেন স্পিলবার্গের 'শিণ্ডলার্স লিস্ট' ছবিটিতে সাদাকালো ছায়াদৃশ্যে যখন নরমেধের চলমান চিত্রমালা আমাদের বারবার ধাক্কা দেয়, অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে যখন নাকে লাগে মাংসপোড়ার কটুগন্ধ, আর সেই মৃতের পাহাড়ের পাশ দিয়ে আচমকা হেঁটে যায় লালফ্রক পরা এক শিশুকন্যা – তখন সেই ভয়ংকর সাদাকালোর বিপ্রতীপে শিশুটির রঙিন কি শিল্পের প্রতি এক আস্থার জন্ম দেয় না? আমরা কি

আক্রান্ত হই না এক ভালোবাসার অসুখে? ঋত্বিক বা ভ্যান গঘের সৃষ্টিতে যখন আসন্ন মৃত্যুগুলি রচিত হয় – তখন তারাও কি এক পরমাশ্চর্য মমতায় মাখা নয়? রঞ্জিত সিংহের এই মৃত্যুচেতনা সেরকমই এক প্রমিত সৌন্দর্য।

বারবার দশকভিত্তিক যে রেফারেন্স- ফ্রেম আমাদের চালিত করে, সেই মাপকাঠিতে রঞ্জিত সিংহ ও শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায় '৫০- র। নারায়ণ মুখোপাধ্যায় '৬০- র। অথচ আমাদের চেনা পঞ্চাশ- ষাটের থেকে এই নামগুলি সম্পুর্ণ আলাদা। এঁরা সেলিব্রিটি নন, হতে চানও নি কোনোদিন। '৬০- এরই আরেক প্রতিনিধি শম্ভু রক্ষিতের 'প্রিয় ধ্বনির জন্য কান্না' [প্রকাশক: মহাপৃথিবী, প্রকাশকাল: ১৯৮৮] বাংলাকবিতার অন্যতম মাস্টারপিস্। বাঙালি পাঠক ক'জন এঁদের পড়েছেন? ক'জন জানেন '৭০- এর অমিতাভ মণ্ডলের নাম? ক'জন জানতে চান – তত্ত্বের বাইরে, নিরীক্ষার বাইরেও যে বিরাট স্পেস জুড়ে বাংলা কবিতারা খেলা করে, তার কথা? ক'জন সত্যিকারের বাংলাকবিতা 'পড়েন'? অথচ একটু খুঁজলেই, কলকাতা ও অন্যান্য জেলা- বইমেলার লিট্‌ল ম্যাগাজিন এরিনা নামক রত্নকুঞ্জের কোনো না কোনো টেবিলে পাঠক আজও পেয়ে যাবেন রঞ্জিত- শম্ভুনাথ- নারায়ণ- শম্ভু- অমিতাভ'র একটা- দুটো রোগাসোগা কবিতাবই।

শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দুটি বইয়ের কথা মনে আসে – 'আকাশগঙ্গার ছবি' [প্রকাশক: কবীর, প্রকাশকাল: ২০১০] ও 'অ্যাটিলার ঘোড়া' [প্রকাশক: প্রান্তর, প্রকাশকাল: ২০১৪]; নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের দুটি বই – 'শূণ্যও বৃত্তের বশ' [প্রকাশক: এবং, প্রকাশকাল: ১৯৮৮] ও 'ধায় যেন' [প্রকাশক: প্রিয়ংবদা, প্রকাশকাল: ২০০৮]; রঞ্জিত সিংহের 'জেব্রার মৃত্যু' [প্রকাশক: উত্তরাধিকার, প্রকাশকাল: ২০০৩] ও 'ব্যাগভর্তি সন্ধ্যাতারা' [প্রকাশক: অস্ট্রিক, প্রকাশকাল: ২০০৯]। এইসব বইয়ের কবিতা সেই প্রবল এক জীবন- ভালোবাসার সৌন্দর্য মাখা। আবার এর পাশাপাশি অমিতাভ মণ্ডলের কবিতায় আছে নতুন এক অনুভবের ভাষা আবিষ্কার। এর আগে খুব বিচ্ছিন্নভাবেই কিছু পত্রিকায় অমিতাভ মণ্ডলের কবিতার মুখোমুখি হয়েছিলাম; তাঁর বেশ কিছু কবিতাবইয়ের সঙ্গে সম্প্রতি পরিচয় হয়ে গেল। তাঁর 'রৌদ্রনামা' [প্রকাশক: অনুবর্তন, প্রকাশকাল: ২০০৬] বাংলাকবিতার এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকাশ। আমরা যে deconstructing an existing text - এর কথা বলি, এই রৌদ্রনামা তাই- ই। রবীন্দ্রনাথের deconstruction, উপনিষদের deconstruction। চিরায়তের deconstruction।

দরোজা জানালা খুলিলাম। আলোর সাক্ষাৎ হইল।
তবু মরিতে পারিতেছি না কেন?
দরোজা জানালা বন্ধ করিলাম। আঁধারের শ্বাস পড়িতেছে।
হায়, মরিতে পারিতেছি না।
গাছ মরিতেছে, নদী মরিতেছে, পাখি মরিতেছে,
বাতাস রুদ্ধ, আকাশ লুপ্ত
মরিবার জন্য রণক্ষেত্র যাইলাম
সাগরে যাইলাম, বিজনে থাকিলাম
মরিতেছি না
নশ্বর সবিতা ঝরিতেছেন
নশ্বর আকাশ ঝরিতেছেন
হয়ত ঈশ্বরও নশ্বর হইলেন
তবু, নাথ, মরিতে পারি না
নীরবে, ঝুরু ঝুরু রৌদ্র উড়িতেছে

এইসব কবিতা মিতবাক্ - এইসব কবিতা রহস্যময়। সেটুকুই তার স্বতন্ত্র সুন্দর। প্রতিমুহূর্তে যেন বা সে কবিতার দরজায় দাঁড়িয়ে শব্দভিক্ষা করে। আর এই এক এক মুঠি ভিক্ষান্নে তৈরি হয় সুজাতার পরমান্ন। ঠিক যেভাবে হাওয়া- বাতাস- জলের খেলায় পাথর ক্ষয়ে ক্ষয়ে প্রকৃতির কোলে আশ্চর্য সব শরীর নেয়, তেমন করে তৈরি হয় এই কবিতা। পাঠক তাই ভুরু কোঁচকালেন। বললেন, এ লেখার ব্যাকরণ- ভাষা পুরোনো। আবার কেউ বললেন এর ভাবের ভাষা চিরকালীন। বলুন, আপনি আমায় পুরোনো বলুন... আমি বলব, পুরানো জানিয়া চেও না, চেও

না আমারে আধেক আঁখির কোণে... কবিতার ভাষা কি শুধুই ব্যাকরণ নাকি অন্য আরও কিছু? আমি নতুন হতে চাই বলেই, Time out আর Timeless- এর দ্বন্দ্বে নতুনের কবিতাপথ খুঁজে নিতে চাই বলেই, গলিঘুঁজিতেও উঁকি দেব অচেনা অপঠিত বাংলাকবিতার জন্য। সেভাবেই রৌদ্রনামা'র অমিতাভ মণ্ডল পড়ে নেব। পড়ে নেব শম্ভু রক্ষিত –

পুরাতন ভাষা ও রীতিনীতি নিয়ে আমি অসংখ্য ক্রুশকাষ্ঠের মত চেয়ে
শব্দে শব্দে আজ কী যেন বলেছি তোমাকে
উষনীর কর্ণসুবর্ণের কাছে যৌবনশ্রী নারীর জয়াপীড় আছে –
... দুর্ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা। তাই তুমি আমাকে দিও না কিছুই
তাই ঘরের মেঝেয় এই অভিনব ও সফল জাহাজ অনুসরণ ...
মাটির ভিতরে এসো, ডুবোজাহাজ উদ্ভাবন আমি, করুণ ধ্বনিতরঙ্গ

সবকিছু ছাপিয়ে চলে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে একটা দুঃখ যেমন লেখা হয়, তেমনই একধরনের মহিমা মাখা অভিমান। এইখানেই কবিতার বীজ লুকিয়ে। যেমন শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় –

সামান্য অশ্বত্থ গাছ, তারও আয়ু সম্রাটের চেয়ে আরও বেশি।
নির্জন বিকেলে এই অশ্বত্থ গাছের নিচে ঝরাপাতা নিয়ে খেলা করি
আমি – ও – কুকুর
মাঠের নৈঃশব্দ্য থেকে গ্রাম থেকে পাখি উড়ে এলে তাকে বলি
দেখে এলে, মানুষের গৃহস্থালি দুদিনের দুঃখমুখে
পূর্ণ কত দূর?
শাখার ভিতরে হাওয়া বয়ে যায়, জেগে থাকে অন্য কোনো সুর –
পাশে নদী, শ্মশানের ওপরে উজ্জ্বল হয় পাখির কাকলি।

জীবনক্লান্তির শেষ। দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজাধিরাজও মাটির সামনে নতজানু। একমুঠো জিরিয়ে নেওয়াটুকু ভিক্ষা করেন বৃক্ষের ছায়ায়। শোকবিলাস নয়, এ তো মানবতাপন্থী কবিতা – মানুষ ও প্রকৃতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ যেখানে পারস্পরিক সহাবস্থানে আছে। কীভাবে আছে, সে এক রহস্য। এই সফলতা... নিষ্ফলতায় কেন যে মনে পড়ে অরসন ওয়েল্‌সের 'সিটিজেন কেইন'- এ মৃত্যুপথযাত্রী এক 'সফল' মানুষের শেষ উচ্চারণ – মাতৃগর্ভের কাছে ফিরে যাওয়া যেন – 'রোজ্‌বাড' ...

নারায়ণ মুখোপাধ্যায় এক কবিতায় লিখেছিলেন –

তোমার লাগিয়া এই নোলক পাঠাইলাম,
পরিয়ো। বাক্সে উঠাইয়া রাখিয়ো না।
...
নোলক পাঠাইলাম – পরিয়ো
ইহা শুধু রূপের লাগিয়া নহে,
মনে রাখিয়ো...

এই- ই তো কবিতার মাপা সৌন্দর্য। যা খোলা চোখে রূপ বলে মনে হলেও, আসলে নয়... এই উচ্চারণের কার্পণ্যই একটা কবিতাকে রূপ থেকে অরূপের দিকে নিয়ে যায়। আমি তো মনে করি – এই কবিতাতেই সীমানা টপকানোর বীজ লুকিয়ে আছে সেই কবে থেকে। শব্দে শব্দে কী যেন বলবার কথা আছে। আছে ডুবোজাহাজ উদ্ভাবনের কথা। অন্ধ আমরা। পাঠক হয়েছি। তবু ধরতে পারিনি...